চাই সবার জন্য শিক্ষা

নিরক্ষরতার হার ২২%

নিজস্ব প্রতিবেদক
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০ এএম

বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে অনেক দূর এগোলেও ২২.১ শতাংশ মানুষ এখনও অক্ষরজ্ঞানহীন। শহরের ভাসমান মানুষ কিংবা গ্রামের হতদরিদ্রে বেড়ে ওঠা ব্যাপক শিশু এখনও প্রাথমিক শিক্ষাবঞ্চিত। শিক্ষাব্যবস্থার মূলধারার বাইরে থাকা এ শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাই একমাত্র ভরসা; কিন্তু প্রকল্পভিত্তিক, স্বল্পমেয়াদি উদ্যোগ এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারছে না।

এমন সব শিশুÑ যারা রাস্তা, রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল, নদীঘাট, ফেরি, হাটবাজার, কিংবা শহরের অলিগলিতে ঘুরে বেড়ায়; তাদের অনেকেই কিশোর-কিশোরী বয়সেই ভিক্ষাবৃত্তি, কুলি, ফেরিওয়ালা, বাসের হেলপার কিংবা ছোটখাটো অপরাধে যুক্ত হয়ে পড়ে। মূলত এই শিশুরা নিজের খাদ্য ও জীবনযাত্রার জন্য নিজেই দায়বদ্ধ। ফলে প্রতিদিনের আয়-রোজগার বন্ধ করে তারা স্কুলে যাবেÑ এটা তাদের বাস্তবতায় সম্ভব নয়। তারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হলেও তাতে স্থায়িত্ব আসে না।

সম্প্রতি শেষ হয়ে গেছে ‘আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম’, যার মাধ্যমে ৮-১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয়বহির্ভূত শিশুদের মূলধারার শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল; কিন্তু দুঃখজনকভাবে এর ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে নতুন কোনো উদ্যোগ এখনও গ্রহণ করা হয়নি, ফলে এসব শিশু আবার ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাক্ষরতা কেবল প্রাথমিক শিক্ষা নয়; এটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার ভিত্তি। অক্ষরজ্ঞানহীন জনগণ আধুনিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। তারা নিয়োজিত থাকে অদক্ষ ও কম মজুরির কাজে। স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রযুক্তি কিংবা নাগরিক অধিকার সম্পর্কে তারা সচেতন নয়। প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে তারা হয়ে পড়ে ডিজিটাল বৈষম্যের শিকার, যা তাদের আরও প্রান্তিক করে তোলে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি হলো প্রাথমিক শিক্ষা। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা এখনও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, যা বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় পিছিয়ে। শিশুদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান ও দক্ষতা গড়ে তুলতে এবং ভবিষ্যতের কর্মজীবনে প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এখন জরুরি। শুধু পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা একজন শিশুর মৌলিক দক্ষতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়।

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎÑ এই কথাটি শুধু বইয়ের পাতা বা বক্তৃতার মঞ্চে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। ভাসমান শিশুরাও এই দেশের সন্তান, তাদের সম্ভাবনাও অপরিসীম। শুধু সমবেদনা নয়, চাই কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ, যাতে তারা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে শিশুদের বিদ্যালয়ে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন সহাতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম, যেখানে পোশাকসহ প্রযোজনীয় শিক্ষা-উপকরণ বিনামূলে সরবরাহ করতে হবে, দুপুরে পরিপূর্ণ খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। যে শিশুর আশ্রয় নেই, ফুটপাত, রেল স্টেশন, গাছতলা বা খোলা আকাশের নিচে যাদের ঠিকানা; তাদের রাষ্ট্রীয় খরচে আশ্রয়ের সুবন্দোবস্ত করতে হবে। হতদরিদ্র পরিবারগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ সব উদ্যেগ ভিন্ন সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হবে।

যদি সরকার আন্তরিক হয়, পরিকল্পনা সুসংহত হয় এবং বাজেট সঠিকভাবে ব্যয় হয়, তাহলে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন সম্ভব। এর প্রমাণ ভারতের কেরালা বা শ্রীলংকা। কেরালায় শিক্ষাকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে। বাংলাদেশকেও এখন সেই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

মনে রাখতে হবেÑ শিক্ষার সঙ্গে জীবিকার সংযোগ। যে জনগোষ্ঠীর শিক্ষাহার বেশি, তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তত উন্নত। শহরের দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের শিক্ষার চেয়ে কাজে পাঠানো বেশি জরুরি মনে করে। তাই শিক্ষা কার্যক্রমে আয়মুখী দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে পরিবারগুলো এটিকে ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে পারে।

আমরা যদি সত্যিই ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ দেখতে চাই, তবে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ, ভাসমান শিশুদের জন্য বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা চালু এবং শিক্ষাকে উন্নয়নের কেন্দ্রীয় অগ্রাধিকার হিসেবে গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।